তারিখ · 18 MAR 2016 ……
পৃষ্ঠা ……৮…… কলাম……২……

জাহাঙ্গীরনগরে নানারূপে 'নস্টালজিয়া'

ফিরে দেখা | আবদুল বায়েস

অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

'নস্টালজিয়া' একটা খুব পরিচিত শব্দ যার বাংলা প্রতিশব্দ দাঁড়ায় স্মৃতিবিধুরতা। যতটুকু জানি, গ্রিক শব্দ নসটস (বাড়ি ফেরা) ও আলজিয়া (আশা বা প্রত্যাশা) নিয়ে নস্টালজিয়া শব্দের উৎপত্তি। এটা সম্ভবত বাড়ি ফেরার উদগ্র বাসনার দিকে ইঙ্গিত করে। বাড়ি ফিরতে কে চায়? বাড়িকে ঘিরে যার স্মৃতি আছে– হোক তা বেদনার বা আনন্দের, অল্প কিংবা বিস্তর। আবার কমবেশি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নস্টালজিয়া কাজ করে এবং নানাভাবে যেমন– আমার পুরনো বন্ধুদের মধ্যে কেউ আছে যারা শৈশবের জায়গায় গেলে কিংবা কয়েক দশক পর পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে; কেউবা আলতোভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে চোখ মোছে। আবার কেউ বুঝতেই দেয় না যে সে স্মৃতিকাতর, পাছে লোকে বলে 'মেয়ে মানুষের মতো কান্দে'। ফেসবুকে পুরনো ছবি সেঁটে দেওয়া হয় নস্টালজিয়া তাড়া করে বলেই। এই যে অত সুন্দর একটা গান– 'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা... গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া জারিগান আর মুর্শিদি গাইতাম...'ও কিন্তু এক ধরনের নস্টালজিক অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ।

ছাত্রজীবন শেষে এবং চাকরি জীবনের কোনো এক ফাঁকে পুরনো ক্যাম্পাসে গেলে প্রথমে যাওয়া হয় নিজের হলে নিজের কক্ষটি দেখতে, তারপর বিভাগে এবং আড্ডার জায়গাগুলো ঘুরেফিরে দেখা ইত্যাদিতে সবসময় নস্টালজিয়া কাজ করে। আমার কলেজ জীবনের এক বন্ধু ছাত্ররাজনীতি করতে গিয়ে প্রচুর মার খেয়েছে। প্রায় প্রতিদিন কেউ না কেউ তাকে হিট করত। দীর্ঘদিন পর কলেজ প্রাঙ্গণে গিয়ে তার প্রথম কথা– জানিস ওই গাছের নিচে শালায় এমন মাইর খাইছি না, হাড্ডিগুড্ডি সব গুঁড়া হইয়া গেছিল। আল্লায় বাঁচাইছে। অন্যদিকে, কারও আছে প্রেমজনিত নস্টালজিয়া– প্রেমের শুরু, বেড়ে ওঠা এবং শেষ হওয়ার জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ানোর মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাওয়া। মোট কথা, নস্টালজিয়া নিত্যদিনের সঙ্গী এবং এর আছে নানা দিক।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মেজবাউস সালেহীন এক মস্তবড় নস্টালজিক। তার প্রিয় এক প্রাক্তন ছাত্র অনেক দিন পর ক্যাম্পাসে এসে সালাম ঠুকতেই বলে উঠতেন : 'মনে আছে, আমার বাসার সামনে গাছের নিচে বইসা বইসা প্রেম করতা? অহনের বউ কি এইডা না হেইডা?'

দুই

১৯৭৫ সাল থেকে শুরু করে দীর্ঘ ৪০ বছর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) শিক্ষকতা এবং চাকরি জীবন শেষে এলপিআরে আছি বলে মাঝে মধ্যে অর্থনীতি বিভাগে যেতে হয়। মনটা খুব ভারি থাকে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হবে– এ কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ করে বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠবে এটা কল্পনা করতেও কষ্ট হতো। কিন্তু যত কষ্টই হোক, দু-এক বছরের মধ্যে আমার সঙ্গে সহকর্মী মুশতাহিদুর রহমান, তাজুল ইসলামসহ প্রায় দুই কুড়ি শিক্ষকের বিদায় নেওয়ার পালা। কোনো একদিন নিজের কক্ষে বসে যখন গুনগুন করে গাইছি,

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচা কেনা,
মিটিয়ে দেব গো, মিটিয়ে দেব লেনা দেনা,

বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে–

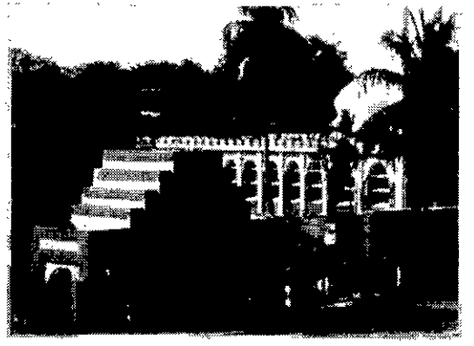

ঠিক তখন স্নেহভাজন সহকর্মী আমজাদ হোসেন আমার কক্ষে এসে হাজির। তার অনুরোধ, আমি যেন তৃতীয় বর্ষে ইন্টারন্যাশনাল কোর্সটা শেষবারের মতো নিই। আমি ওর কথায় রাজি হয়ে গেলাম মূলত নস্টালজিয়ার কারণে। মনে পড়ে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রকাশনা আমার লেখা বই- 'ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিকস উইথ রেফারেন্স টু বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড'। এটা ১৯৮০ সালের কথা; আমি তখন একজন প্রভাষক। প্রয়াত জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর, কায়সার হোসাইন সভাপতি ও আবুল হোসেন চৌধুরী রেজিস্ট্রার। খুব কষ্টে আমরা কয়েকজন এক রুমে বসতাম; পুরো অনুষদে মাত্র দু'জন মহিলা শিক্ষক– একজন হিন্দু, একজন মুসলমান। অর্থনীতি বিভাগটি ছিল বর্তমান বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের জায়গায় অর্থাৎ আলবেরুনী হলের পাশে। একজন প্রভাষক হয়ে সম্মান শ্রেণীর জন্য ইংরেজিতে একটা টেক্সট বই লেখা আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন– সম্ভবত কমিটেডও ছিলাম অনেক বেশি। তখনকার বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার অনেক ছোট ছিল– দু-একশ' ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক আর কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে আরও দু-একশ'। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ তখনও কার্যকর হয়নি; উপাচার্যের আদেশে বিশ্ববিদ্যালয় চলত। একবার বেতন বাড়ানোর অনুরোধ করতে প্রয়াত বন্ধু সেলিম আল দীনের

> ছাত্রজীবন শেষে এবং চাকরি জীবনের কোনো এক ফাঁকে পুরনো ক্যাম্পাসে গেলে প্রথমে যাওয়া হয় নিজের হলে নিজের কক্ষটি দেখতে তারপর বিভাগে এবং আড্ডার জায়গাগুলো ঘুরেফিরে দেখা ইত্যাদিতে সব সময় নস্টালজিয়া কাজ করে। আমার কলেজ জীবনের এক বন্ধু ছাত্ররাজনীতি করতে গিয়ে প্রচুর মার খেয়েছে। প্রায় প্রতিদিন কেউ না কেউ তাকে হিট করত

নেতৃত্বে আমরা ৫-৬ জন প্রভাষক তৎকালীন উপাচার্য এবং বাংলা ভাষায় পণ্ডিত এনামুল হকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। একটু বসতেও বললে না বরং কালো চশমার ফ্রেমের ভেতর দিয়ে কটমট করে তাকিয়ে চাটগাঁয়ের ভাষায় বললেন : এই বেতন পছন্দ না হলে চলি যাও, আরও কম বেতনে কাজ করতে অনেক লোক বসি আছে। উপাচার্যের মুখ থেকে এমন ঝাঁঝালো বক্তব্য ভাবা যায়? হ্যাঁ, ভাবা যায়; কারণ কবির কথায়, শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে। নিজের অভিজ্ঞতায় জানি, আদর করতে জানলে বাঁদরকেও নাচানো যায়। কোনো কোনো উপাচার্য শুধু শাসন করতেই আনন্দ পান– সোহাগ করতে জানেন না বলেই যত সম্ভবত বিপত্তি। এর উল্টাটাও বহাল তবিয়তে আছে– শুধু সোহাগ চলে কিন্তু শাসনের দেখা নেই। 'ক্যাডার' পরিবেষ্টিত এসব উপাচার্য খুব 'জনপ্রিয়', 'সরকার প্রিয়' এবং 'দল প্রিয়'। তবে নিজে ফ্রাংকেনস্টাইন বানালে ফ্রাংকেনস্টাইনের হাতে বধ হতে হয়– এমন উদাহরণও খুব একটা বিরল নয়।

তিন

শেখ মনজুরুল হক ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক, বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত ডিন ও আত্মীয়তার সূত্রে পরিচিত। তিনি ফোন করলেন বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে আমার একটা লেখা পাওয়ার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয় দিবস মানে প্রতিষ্ঠানটির জন্মদিন। বুঝতে কষ্ট হয় না যে, কাজটি ওর ঘাড়ে চেপেছে। আমি প্রশাসনে থাকার সময়ও এ ধরনের কাজ ওকে দেওয়া হতো; কারণ, ছবি আঁকা ও সম্পাদনায় সে বেশ ভালো। না লেখার পক্ষে শত যুক্তি থাকা সত্ত্বেও শেষমেশ মনজুরের অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হলো। যেহেতু তার অনুরোধটা কিছুটা হলেও আমার মধ্যে নস্টালজিকতা উস্কে দেয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস বা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিন পালনের কাজটি শুরু হয় আমি উপাচার্য থাকাকালে। দায়িত্ব নিয়েই কী করলে স্মরণীয় হয়ে থাকা যাবে এটা যখন ভাবছিলাম, তখন সহকর্মীদের পরামর্শে প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালনের উদ্যোগ নিলাম। এর আগে আমিরুল ইসলাম চৌধুরীর সময় ২৫ বছর পূর্তি হয়েছিল। ভাবলাম, প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস করতে পারলে এই ইতিহাস বিকৃতির দেশেও অন্তত কেউ না কেউ আমাকে স্মরণ করবে। আমার খুব আপনজনরা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। তাদের কর্মভাবনা ও সাফল্যগাথা নিয়ে আমি কয়েকটা নিবন্ধ লিখেছি এবং সারাবিশ্ব ও দেশ কর্মের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের স্মরণ করছে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর যেভাবে স্মরণ করা হয় তা দেখে কখনও-সখনও ভাবি, মৃত্যুর পর কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে কেউ যদি আমার নামটি নেয় তো মন্দ হবে না।

চার

যাক সে কথা। প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস অনুষ্ঠিত হয় ২০০০ সালের ১২ জানুয়ারি। আমি তখন ভিসি, ড. তাজুল ইসলাম প্রো-ভিসি ও ড. শরীফ এনামুল কবীর ট্রেজারার। হালকা মেজাজে বলতে গেলে, ভিসির অফিসের একপাশে নিচু স্বরে প্রো-ভিসি ও অন্য পাশে উঁচুস্বরে ট্রেজারার– দু'জনই বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার বাসিন্দা। নতুন প্রশাসন নতুন কিছু করার দৃপ্ত প্রত্যয়ে আওয়ান বিধায় প্রথমবারের মতো সে এক বিশাল আয়োজন। প্রথমবার হচ্ছে বলে যেন সবাই এসে হাজির। শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী যেমন, কর্মকর্তা-কর্মচারীও তেমন আনন্দে উদ্বেলিত। সারাদিন মিছিল-মিটিং, খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, হৈচৈ-রৈরৈ ব্যাপারস্যাপার। মৃতপ্রায় জাবি যেন জেগে উঠল নতুন জীবনে এবং এখনও প্রতিবছর জেগে ওঠে। সেই থেকে জাবি বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ও আমি যেন সমার্থক হয়ে উঠলাম :

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি– আহা,
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহু-ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।